নতুন নির্বাচন কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (০২ মার্চ ২০১৭)

বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ কর্তৃক সাবেক সচিব জনাব কেএম নূরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহবুব তালুকদার, সাবেক সচিব মো. রফিকুল ইসলাম, সাবেক জেলা জজ কবিতা খানম এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী-কে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হয়েছে। আমরা নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে স্বাগত জানাই। একইসঙ্গে পুরো জাতির স্বার্থে আমরা তাঁদের সফলতা কামনা করি। তাঁদের সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুজন-এর পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস জানাই। আশা করি, বিদায়ী রকিবউদ্দীন কমিশনের মত তাঁরা আমাদের সহযোগিতা নিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

নবগঠিত নূরুল হুদা কমিশন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সফলতা অর্জন করতে হলে তাঁদেরকে এগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এসব চ্যালেঞ্জের প্রধান উৎস হলো বিদায়ী রকিবউদ্দীন কমিশনের ব্যর্থতা। সরকারও অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাদের সংখ্যা। আমরা কমিশনের সামনের বড় চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নে তুলে ধরছি।

কমিশনারদের সংখ্যা: রকিবউদ্দীন কমিশন ছাড়া অতীতের কোনো নির্বাচন কমিশনেই তিনজনের বেশি সদস্য ছিলেন না এবং এই তিনজনও অনেক সময় একত্রে কাজ করতে পারেননি। পাঁচ সদস্যের নবনিযুক্ত কমিশনারদের সবাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অনেক বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত থাকাই স্বাভাবিক। দুই-তিনজনের মতামতের মধ্যে সমন্বয় করা যত সহজ পাঁচজনের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি দুরুহ। তাই পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বর্তমান কমিশনের ক্ষেত্রে একটি বড় ঝুঁকি হলো তাদের মধ্যে সম্ভাব্য মতানৈক্য। বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আশা করি নবগঠিত কমিশন এ চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারবে।

কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা: পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের সামনে অন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হলো কমিশনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা। অনেকেরই স্মরণ আছে যে, অতীতে কমিশনের সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আইনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও আমাদের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা দেওয়া আছে। তবে সাংবিধানিক নির্দেশনা দিয়ে বা আইন করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায় না। আর কমিশন নিরপেক্ষ হলেই সব দলের জন্য নির্বাচনী মাঠ সমতল হবে এবং সবাই নির্বাচনে অংশ নিবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন না হলে এবং ভোটারদের সামনে বিকল্প না থাকলে তাকে নির্বাচন বলা যায় না, কারণ 'নির্বাচন' মানেই বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া। এছাড়াও, কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব শুধু নির্বাচন করাই নয়, বরং যথাসময়ে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। আশার কথা যে, আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতিমধ্যেই সংবিধানকে সমুন্নত রেখে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশাবাদী হতে চাই যে, তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ সততা, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করবেন।

আরেকটি বিষয় হলো, বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম-কমিশনে আলাদা ক্যাডার নেই। বিভিন্ন দপ্তর থেকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেয়া হয়। এতে দেখা যায়, নিয়োগপ্রাপ্তরা কমিশন ও নির্বাচন পরিচালনা-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা রাখেন না। তাছাড়া এটি কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। আমরা জানি, বর্তমান কমিশনের সর্বমোট ৪ হাজার কর্মকর্তা রয়েছে। তাই পুরো কমিশনকে সুচারুভাবে পরিচালনা ও কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা নির্বাচনী ক্যাডার থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি।

প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ: *নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮* এবং এর ২০১৬ সালের সংশোধনীও নতুন নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এই বিধিমালায় নির্বাচন কমিশনের সচিব থেকে শুরু করে জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা পদে সরকারি কর্মকতাদের প্রেষণে বদলি করার বিধান রাখা হয়েছে। আর প্রেষণের মাধ্যমে সরকার পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের কমিশনের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতে পারে, যা অতীতের সরকারগুলো করেছে। নতুন নির্বাচন কমিশনকে এব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষত জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা-সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে, যেসব পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নির্বাচনী ফলাফল সরাসরিভাবে প্রভাবিত করতে পারে, কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: আগের শামসুল হুদা কমিশনের নেতৃত্বে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠি আরও কঠোর করা হয়েছিল। ভোটারদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। 'না-ভোটে'র বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে সংসদ সদস্য পদে মনোনয়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। (প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদ 'না-ভোটে'র বিধান অনুমোদন করেনি এবং মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের নেতা-কর্মীদের মতামতের প্রাধান্যকে খর্ব করেছে)। রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছিল। নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে তাদের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন নিষিদ্ধ করার বিধানও রাখা হয়েছিল। আরও বিধান রাখা হয়েছিল সকল রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা বিলুপ্তির। একইসঙ্গে রাজনৈতিক দলের সকল কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখারও বিধান করা হয়েছিল।

এগুলো ছিল যুগান্তকারী রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার, যেগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুজন নির্বাচন কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছিল। আমরা অনেকগুলো সংস্কার ভাবনা উত্থাপন করেছিলাম এবং একইসঙ্গে এগুলোর ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করেছিলাম। সুজন-এর পক্ষ থেকে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের* একটি খসড়াও নবগঠিত শামসুল হুদা কমিশনকে প্রদান করা হয়। আমাদের এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংস্কার ধারণাগুলো নিয়ে শামসুল হুদা কমিশন তাদের নিজস্ব সংস্কার প্যাকেজ তৈরি করে এবং রাজনৈতিক দল (যদিও বিএনপি এতে অংশগ্রহণ করেনি), নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপের পর সেগুলো রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ আকারে জারি করেন।

প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রণীত 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী সংস্কার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছিল। রকিবউদ্দীন কমিশন এব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। বরং তারা প্রার্থিতা বাতিলসহ তাদের নিজেদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নেয়, প্রবল সমালোচনার মুখে যা থেকে তারা বিরত হয়। এছাড়াও তারা স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে, যা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা কমাতে ভূমিকা রাখে এবং ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধিকে সীমিত করে। তাই নবগঠিত কমিশনের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো নির্বাচনী ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

আইনি কাঠামোতে পরিবর্তন: সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে আইনি কাঠমোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো হলো: *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও); *ভোটার তালিকা আইন*, ২০১০; *নির্বাচনী এলাকা সীমানা নির্ধারণ আইন*, ২০১০; *রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন*, ১৯৯১; *জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন*, ২০০৪; *নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন*, ১৯৯১ ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে আচরণবিধি-সহ আরও অনেকগুলো বিধিমালা। উপরন্তু, স্থানীয় সরকারের সবগুলো আইনেই নির্বাচনী বিধান রয়েছে। এসব আইনে ও বিধি-বিধানে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা নতুন কমিশনের জন্য আইনি কাঠামোতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি:

(১) 'না-ভোটে'র বিধানের পুনঃপ্রবর্তন; (২) মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিলের বিধান; (৩) জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী দাখিলের বিধান; (৪) সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে প্রদান; এবং (৫) রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি।

আইনের প্রয়োগ: সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আইন ও বিধি-বিধানে সংস্কার করলেই হবে না, নির্বাচন কমিশনকে সেগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এব্যাপারে আমাদের অতীতের নির্বাচন কমিশনগুলোর অপারগতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য তৃণমূল থেকে প্যানেল তৈরির যে আইনি বাধ্যবাধকতা তা প্রায় সব দলই উপেক্ষা করে আসছে। নির্বাচন কমিশনও এব্যাপারে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেনি। এছাড়াও নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করার বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার প্রতি রাজনৈতিক দলগুলো ভ্রুক্ষেপও করছে না, যদিও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনগুলোতে তাণ্ডব সৃষ্টি করেই চলছে। এছাড়াও আরপিও'র ৯০(গ) ধারা অনুযায়ী, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা থাকা বেআইনি, যাও রাজনৈতিক দলগুলো অমান্য করেই চলছে। তাই নতুন নির্বাচন কমিশনকে আইনকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে।

ভোটার তালিকা: নির্ভুল ভোটার তালিকা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত এবং ভোটার তালিকা তৈরি নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ২০০৮ সালে সেনাবাহিনীর সহায়তায় একটি ছবিযুক্ত সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যে তালিকায় পুরুষের তুলনায় ১৪ লাখের বেশি নারী ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ভোটার তালিকায় হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় 'জেন্ডার-গ্যাপ' দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ পুরুষ ভোটারের তুলনায় নারী ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্বশেষ খসড়া হালনাগাদের তথ্য অনুযায়ী, মোট ১৪ লাখ ৯৭ হাজার ৬৭২ জন ভোটার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা মাত্র পাঁচ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬০ জন, অর্থাৎ নারী-পুরুষের অনুপাত ৪০:৬০ এবং জেন্ডার-গ্যাপ ২০ শতাংশ (*বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ৩ জানুয়ারি ২০১৭), যদিও হালনাগাদের মাধ্যমে মোট কত ভোটার তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে তা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের হালনাগাদে প্রায় ৪৭ লাখ নতুন ভোটার ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন এবং তখন জেন্ডার-গ্যাপ ছিল ১২ শতাংশ। আমাদের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষের হার প্রায় সমান সমান। এছাড়াও আমাদের প্রায় এক কোটি নাগরিক বিদেশে কর্মরত, যাদের প্রায় সবাই পুরুষ এবং অধিকাংশই ভোটার নন। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় ভোটার হওয়ার মত অনেক যোগ্য নারী ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন এবং এর বিহিত করার লক্ষ্যে কমিশনকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

সীমানা পুনঃনির্ধারণ: নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণও নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কয়েকটি সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে তা করা হয়, যার একটি হলো সংসদীয় আসনগুলোতে ভোটার সংখ্যায় যতদূর সম্ভব সমতা আনা। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ৮৭টি নির্বাচনী এলাকায় সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়ছে এবং এরফলে ভোটার সংখ্যায় অসমতা আরও বেড়েছে, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড উভয়েরই লঙ্ঘন। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের পর ২০০৮ সালে যেখানে গড় ভোটার সংখ্যার ±২১ শতাংশের মধ্যেকার আসন সংখ্যা ছিল ৮৩টি, সেখানে ২০১৪ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১০২টিতে। অর্থাৎ সীমানা পুনঃনির্ধারণের পর আসনওয়ারী ভোটার সংখ্যার তারতম্য আরও বেড়েছে। এছাড়াও রকিবউদ্দীন কমিশনের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ নিয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল (*প্রথম আলো*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩)। তাই নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের দিকেও কমিশনকে নজর দিতে হবে।

মনোনয়ন: শামসুল হুদা কমিশনের সময়ে অধ্যাদেশ আকারে যে আরপিও জারি করা হয় তাতে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার বিধান ছিল। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ কিছু নির্বাচনী এলাকায় এধরনের প্যানেল তৈরি করলেও, বিএনপি আইনের এবিধান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। তবে আওয়ামী লীগও সব ক্ষেত্রে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দেয়নি। তবে অধ্যাদেশটি অনুমোদনের সময়ে নবম সংসদ এ বিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডকে আর তৃণমূলে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে না, বোর্ডকে তা শুধু বিবেচনায় নিতে হবে। তাই সংসদ নির্বাচনে উড়ে এসে জুড়ে বসার সমস্যা দূর করতে হলে মনোনয়নের ক্ষেত্রে আগের অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধানটি ফিরিয়ে আনা জরুরি এবং নতুন কমিশনকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

হলফনামা: সুজন-এর প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ছাড়া আর সব নির্বাচনেই ভোটারদের অবগতির জন্য প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়ের উৎস, ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের বিবরণ, নিজেদের এবং নির্ভরশীলদের সম্পদের হিসাব প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ে সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে এসব তথ্য ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও, কমিশন তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে প্রায় সব নির্বাচনেই হলফনামায় প্রদত্ত এসব তথ্যের তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে তা বিতরণ করেছি, ভোটারদের কাছে যা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। (দেখুন: http://votebd.org)। গণমাধ্যমও এখন একাজে এগিয়ে এসেছে এবং আনন্দের কথা যে, এটি এখন একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

তবে হলফনামার ছকে গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, এতে স্থাবর সম্পদের হিসাব ক্রয় মূল্যে প্রদর্শনের বিধান রাখা হয়েছে, যাতে প্রার্থীর ও প্রার্থীর নির্ভরশীলদের প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ নিরুপন করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও আমরা মনে করি যে, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করে অসমাপ্ত হলফনামা প্রদানকারী, তথ্য গোপনকারী ও ভুল তথ্য প্রদানকারীর প্রার্থিতা বাতিল কিংবা তাদের নির্বাচন বাতিল করলে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখা যাবে এবং আমাদের রাজনীতি বহুলাংশে কলুষমুক্ত হবার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। তাই নবগঠিত কমিশনকে আমরা হলফনামার ছকটিতে পরিবর্তন আনার এবং হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যগুলো কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করার উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করছি। একইসঙ্গে প্রার্থীরা যেন আয়কর বিবরণীর পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়ে পার পেয়ে না যায়, কমিশনকে তা নিশ্চিত করারও আমরা অনুরোধ করছি। নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাচনী ব্যয়: নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে – রকিবউদ্দীন কমিশন এই সীমাকের ১৫ লাখ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা করেছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের খবর আমরা প্রতিনিয়ত শুনি। বস্তুত নির্বাচন – সব স্তরের নির্বাচন – এখন টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে এবং আমাদের গণতন্ত্র হয়ে পড়েছে 'বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই' বা টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন উত্তম গণতন্ত্র। ফলে শুধুমাত্র জাতীয় সংসদই নয়, এমনকি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোও এখন ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত। বস্তুত আমাদের দেশে রাজনীতির ব্যবসায়ীকরণ হয়েছে এবং ব্যবসায়ের রাজনীতিকরণ হয়েছে। তাই নতুন নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরতে হবে এবং একইসঙ্গে নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা কমাতে হবে, যাতে ভোটাধিকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হবার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থী কর্তৃক পোস্টার-লিফলেট ছাপানো ও সকল ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রচার এবং সকল প্রার্থীকে এক মঞ্চে এনে প্রজেকশন মিটিং আয়োজনের মধ্য দিয়েও নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মনোনয়ন বাণিজ্য: মনোনয়ন বাণিজ্য আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আজ এক ধরনের প্রহসনে পরিণত করে ফেলেছে। অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু দলভিত্তিক নির্বাচনের কারণে এ ব্যধি এখন স্থানীয় সরকার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে এর অবসান আবশ্যক এবং আমরা আশা করি যে, নতুন কমিশন এব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। তৃণমূল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বিধান কার্যকর হলেই মনোনয়ন বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পাবে বলে আমরা মনে করি।

রাজনৈতিক দলের হিসাব-নিকাশ: নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অডিট করা আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হয়। আমরা *তথ্য অধিকার আইনের* অধীনে এগুলো কমিশনের কাছে চেয়েও পাইনি। এমনকি তথ্য কমিশনে গিয়েও এর প্রতিকার পাইনি। এরপর উচ্চ আদালতে গিয়ে আমরা যে রায় পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে, যেকোনো 'কর্তৃপক্ষে'র কাছে থাকা সব তথ্যই, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, 'পাবলিক ইনফরমেশন,' যেগুলো পাওয়ার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। (দেখুন: http://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/814462_W.P798of2015.pdf) আশা করি, কমিশন বিষয়টি স্মরণে রাখবে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধে রাজনৈতিক দলের অর্থের উৎসের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেবে। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী ভারতে এব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসা: সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচনী বিরোধ সংক্রান্ত মামলাগুলো নিস্পত্তির ব্যাপারে ব্যাপক দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী মামলা সংসদের মেয়াদ শেষ হবার আগেও নিস্পত্তি হয় না। এধরনের দীর্ঘসূত্রিতা নির্বাচনী অপরাধকেই উৎসাহিত করে। তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে বিশেষ (নির্বাচনী) ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করার দিকে নির্বাচন কমিশনকে মনোযোগ দিতে হবে।

সহিংসতা রোধঃ শামসুল হুদা কমিশনের সময়ে নির্বাচনী সহিংসতা ছিল না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। সেই কমিশনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীরাও আইনকানুন মানা শুরু করেছিল। কিন্তু রকিবউদ্দীন কমিশনের মেয়াদকালে নির্বাচনী সহিংসতা বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছে। যেমন, গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১৫০ জন নিহত হয়েছেন, বহু ব্যক্তি আহত হয়েছেন এবং ব্যাপক জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তাই নতুন নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী সহিংসতা রোধেও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

আচরণবিধিঃ প্রত্যেক নির্বাচনের জন্যই নির্বাচন কমিশন একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে, সংশ্লিষ্টরা তা মেনে চললে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু রকিবউদ্দীন কমিশনের মেয়াদকালে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীরা আচরণবিধি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছে এবং নির্বাচন কমিশনও এব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই পুনর্গঠিত কমিশনকে এব্যাপারে নজর দিতে হবে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৯৯০ সালে প্রণীত 'তিন জোটের রূপরেখা'য় অন্তর্ভুক্ত আচরণবিধিটি কাজে লাগানোর উদ্যোগও কমিশন নিতে পারে।

আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাঃ রকিবউদ্দীন কমিশন আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভোটার তালিকা হালনাগাদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের জন্য কয়েকটি সুস্পষ্ট আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে: (১) প্রতিবছর ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে হবে; (২) জানুয়ারি মাসে হালনাগাদের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে; (৩) হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহকারীদের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে; (৪) ১৮ বছরের কম বয়সীদের নিবন্ধন করতে কমিশনের আইনগত কোনো ক্ষমতা নেই; (৫) হালনাগাদ করা তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; এবং (৬) কেউ ভোটার তালিকার কপি চাইলে কমিশনকে তা সরবরাহ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আইনি এসব বাধ্যবাধকতার একটিও রকিবউদ্দীন কমিশন মানেনি (*প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫)। এমনকি উচ্চ আদালতের নির্দেশনা সত্ত্বেও নির্বাচনী অভিযোগ নিস্পত্তি করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য তাদেরকে আদালতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করতে হয়েছে। এছাড়াও, প্রার্থীদের দাখিল করা হলফনামা এবং কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের ফলাফল সময়মত এবং অনেক সময় কমিশনের ওয়েবসাইটে থাকে না। এদিকেও কমিশনের নজর দিতে হবে।

আইন প্রণয়নঃ আমাদের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের বিধি-বিধান সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে একটি আইন করার নির্দেশনা রয়েছে, গত ৪৫ বছরেও যা বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত নির্বাচন কমিশন এ লক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া তৈরি করে রেখে গিয়েছে, যেটি সম্পর্কে রকিবউদ্দীন কমিশন কোনোরূপ উদ্যোগই নেয়নি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন অতি জরুরি, তাই নতুন কমিশনকে এব্যাপারে মনযোগী হতে হবে। ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিতর্ক এড়াতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কমিশনকে আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত করতে হবে এবং এটিকে আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারকে রাজি করাতে হবে। প্রস্তাবিত আইনে মোটাদাগে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক: (১) কমিশনের কার্যপরিরিধি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা; (২) প্রধান নির্বাচন কমিশনারও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ড; (৩) অনুসন্ধান কমিটির গঠন পদ্ধতি; এবং (৪) কমিশনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা।

নির্বাচন ইভিএম-এর ব্যবহারঃ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার করা হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে। এর একটি কারণ আস্থাহীনতা। আমরা মনে করি, তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা যেতেই পারে। কিন্তু ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে কিছুটা ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়া এবং যাদের ওপর ইভিএম মেশিন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হবে তাদের ওপর আস্থার বিষয়টিও ভাবা দরকার বলে আমরা মনে করি।

সরকারের ও রাজনৈতিক দলের সদাচারণঃ সবচেয়ে নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ও সাহসী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, যদি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকার নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল আচরণ না করে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন না করে। বস্তুত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত বা 'নেসেসারি কন্ডিশন', কিন্তু যথেষ্ট বা 'সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন' নয়। অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সরকারের সদাচারণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের সহায়তা ও সদাচারণ নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে একটি ঐকমত্য জরুরি।

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, বিগত রকিবউদ্দীন কমিশনের ব্যর্থতা আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে খাদে ফেলে দিয়েছে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক জন-অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এরফলে আমাদের রাজনীতিতে অনেকগুলো জটিলতা দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমাদের ঘাড়ে পড়তে শুরু করেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতে বিতর্কিত নির্বাচন এড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা আশা করি, নবগঠিত নির্বাচন কমিশন তাদের সততা, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবেন। তাঁদের প্রতি আমাদের শুভকামনা ও সহায়তার আশ্বাস রইল। আর তাঁরা সফল না হলে এর দায় সরকার ও অনুসন্ধান কমিটিকেও নিতে হবে।

---

০১ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবে সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত